ইসলাম ও গণতন্ত্র

একটি পর্যালোচনা

মূল:

মুফতি উবাইদুর রহমান মারদান (পাকিস্তান)

প্রধান মুফতি, মারকাজুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, মারদান

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন বশির

শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.

শিবুমার্কেট, পাঠানটুলি, নারায়নগঞ্জ

ইসলামের রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যাবস্থা কী? গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কী সম্পর্ক? খিলাফত ও গণতন্ত্রের মাঝে কী পার্থক্য? ইসলাম কী স্বীয় অনুসারীদের কাছে বিশেষ কোনো শাসনব্যবস্থার দাবি করে? যদি বিশেষ কোনো শাসনব্যাবস্থার দাবি করে, তাহলে সেই শাসনব্যাবস্থার মৌলিক ভিত্তি কী?

এটা এমন এক বিষয়, যা নিয়ে শতাব্দীকাল ধরে লেখা যাবে। যার প্রতিটি দিক নিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ লেখালেখি হয়েছে। যুগে যুগে এই বিষয়ে এত পরিমাণ কিতাবাদি লেখা হয়েছে, যেগুলো একত্র করলে একটা বিশাল লাইব্রেরী হয়ে যাবে। একারণে এবিষয়ে অতিরিক্ত কিছু লেখার তো তেমন প্রয়োজনও নেই, আবার সময় হচ্ছে না। কিন্তু ইদানিং এবিষয়ে কিছু লেখালেখি সামনে এসেছে, তারমধ্যে একটি হলো, মুহতারাম জনাব মুহাম্মদ ইসরার মাদানি সাহেব রচিত "ইসলাম, জমহুরিয়্যাত ওর আইনে পাকিস্তান", যা কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। সামগ্রিকভাবে এই বইতে গণতন্ত্র ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে। গণতন্ত্রের বিভিন্ন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, পাঠক সহজেই বুঝে নিবে যে, গণতন্ত্র ইসলামেরই একটি শাসনব্যবস্থা, গণতন্ত্র ছাড়া ইসলামের পৃথক কোনো শাসনব্যবস্থা নেই।

মুহতারাম লেখক "জমহুরিয়্যাত ক্যা ইসলামি তাসাওউর" শিরোনামে লিখেন,

'গণতন্ত্রের সাদামাটা উদ্দেশ্য হলো, জনসাধারণের সামষ্টিক বিষয়াদি পরিচালনার জন্য অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। এটা শুধু চূড়ান্ত স্বভাবজাত বিষয় ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিই নয়, বরং দীনের মৌলিক দাবিতেও উত্তীর্ণ। কুরআনুল কারীমের আদেশ,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

আর তাদের বিষয়াদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে। (সূরা শুরা: ৩৮)

এ আয়াতে একথাই বুঝানো হয়েছে। এ বিধানের দাবি শুধু এতটুকুই নয় যে, প্রথাগত পদ্ধতিতে পরামর্শ করে নেওয়া হবে; বরং মাশওয়ারা অনুযায়ী সিদ্ধান্তও বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এ মাশওয়ারা কোনো বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ ঘরোয়ার সাথে সীমাবদ্ধ হতে পারবে না, বরং সর্বশ্রেণীর লোকদের মাশওয়ারা বা মতামতের সমান অধিকার প্রদান করা হবে, আর এর নামই হলো গণতন্ত্র।'

এর কয়েক লাইন পরে লেখেন, 'গণতন্ত্রের বিপরীতে কেবলই স্বৈরতন্ত্র'।

প্রয়োজন তো হলো উক্ত কিতাবের প্রতিটি অধ্যায় ধরে ধরে তার পর্যালোচনা পেশ করা। কিন্তু আপাতত বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে শুধু খিলাফত ও গণতন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করাকেই যথেষ্ট ও জরুরি মনে করছি। সহজতার জন্য আলোচনা নিম্নোক্ত বিন্যাসে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা উপকারী মনে হয়েছে।

ক. ইসলামের কী নিজস্ব কোনো শাসনব্যবস্থা আছে?
খ. ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের মাঝে মৌলিক পার্থক্য কী?
গ. ইসলামি খেলাফ প্রতিষ্ঠা ফরজ হওয়ার দলিল।
ঘ. একটি আপত্তি ও তার জবাব

ক. ইসলামি শাসনব্যবস্থা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে মানবজীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য কিছু বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে সে শরয়ী বিধিবিধান থেকে স্বাধীন ও উর্ধ্বে।

বরং মুসলমানের ঈমানের আবশ্যকীয় অংশই হলো সমস্ত শরয়ী বিধিবিধান পালনে সে বাধ্য থাকবে। ব্যক্তিজীবনের জন্য যেমন মনে করা হয়, জীবনের প্রতিটি বাঁকে ব্যক্তির ওপর কিছু শরয়ী বিধিনিষেধ রয়েছে, তেমনি সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও 'ইসলামি শরীয়াহ' কিছু দিকনির্দেশনা ও শিক্ষা প্রদান করে, যেগুলো মেনে চলা জরুরি। রাজনীতি ও শাসনপরিচালনাও সামাজিক জীবনের একটি আবশ্যকীয় ও মৌলিক অংশ। তাই এক্ষেত্রেও কোনো মুসলমান স্বাধীন নয়—চাইলে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে কিংবা করবে না, অথবা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। বরং শরীয়ত এ অঙ্গনেও মুসলমানদের কিছু বিধিবিধান ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে, যেগুলো মেনে চলার ব্যাপারে তাকে দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। এটা ঠিক যে, কুরআন-সুন্নাহ নাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট কোনো বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দায়িত্বারোপ করেনি, বরং শাসনপরিচালনার সামগ্রিক কিছু বিষয় উম্মতের উপর আবশ্যক করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে শাসন পরিচালনার যেসব দায়িত্ব ও লক্ষ-উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, তার থেকে সুস্পষ্টভাবে এব্যাপারে অবগতি লাভ করা যায় যে, শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী? আর ইসলাম স্বীয় অনুসারীদেরকে কোন ধরণের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি করে? সূরা হজ্জে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴾

তারা এমন যে, আমি তাদের পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও

অসৎকার্য নিষেধ করবে। আর সবকিছুর পরিণাম আল্লাহরই এখতিয়ারে।[1]

এই আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে, কুরআনের দৃষ্টিতে বাদশাহী, রাজত্ব এগুলো স্বত্ত্বাগতভাবে উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো,
১. শাসকগণ গুরুত্বের সাথে নামায কায়েম করবেন।
২. যাকাতব্যবস্থার গুরুত্বারোপ করবেন।
৩. আমর বিল মারুফ তথা সৎকাজের আদেশ করবেন।
৪. নাহী আনিল মুনকার তথা অসৎকাজ থেকে নিষেধ বরবেন।

"মারুফ" তথা সৎকাজ, এ শব্দের ব্যপকতার মধ্যে তাওহীদ থেকে নিয়ে মুস্তাহাব পর্যন্ত সর্বপ্রকার নেককাজ অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে "মুনকার" তথা অসৎকাজ গুনাহ ও নাফরমানিকে বলা হয়, মাকরুহাত থেকে শুরু করে কুফর-শিরক পর্যন্ত সর্বপ্রকার অবাধ্যতা ও সগিরা-কাবিরা গুনাহও এর অন্তর্ভূক্ত। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, শাসনক্ষমতা ও বাদশাহীর মূল মাকসাদ হলো দীন কায়েম করা। এখন যে শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য হবে দীনে ইসলাম ও তার বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা, সেটা ইসলামি শাসনব্যবস্থা। এর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীত্বের জন্য যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয় তাকে ইসলামি রাজনীতি বলা হয়। পক্ষান্তরে যা এর বিপরীত হবে অর্থাৎ হয়তো রাজনীতি বা শাসনব্যবস্থার মাকসাদ ইকামাতে দীন নয়, অথবা কর্মপদ্ধতি কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা বিরোধী হয়, তাহলে সেটা কোনোভাবেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও ইসলামি রাজনীতি বলার উপযুক্ত নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার খোলাফায়ে রাশেদিন নিজ নিজ যামানায় রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার যে যে কর্মপন্থা অবলম্বন

[1] সূরা হজ্জ : ৪১

করেছিলেন, তা এই আয়াতের পূর্ণ বাস্তব রূপ ছিলো। যার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিলো দীন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। একটু যদি চিন্তা করা হয় তাহলে দিবালোকের ন্যায় একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সকল মহান ব্যক্তিবর্গ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন, সেগুলো ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠার কল্পনা করাও মুশকিল। পরিপূর্ণ ইসলামকে বাস্তবে রূপদান ও এক শাশ্বত ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করার এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য কর্মপন্থা, খোলাফায়ে রাশেদিন যার ওপর আমরণ অবিচল ছিলেন। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, যেসকল ব্যক্তিগণ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করাকে মুসলিম উম্মাহের সামগ্রিক ফরজ মনে করেন তাদের কথা আপন জায়গায় পরিপূর্ণ সঠিক।

সুতরাং ইসলামি শাসনব্যবস্থা সেটাকেই বলা হবে যার মূলভিত্তিই হলো দীন প্রতিষ্ঠা করা। আর এটা স্পষ্ট যে, শুধু নাম নেওয়ার দ্বারা কোনোকিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলভিত্তি হয়ে যায় না, যতক্ষণ না দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যবাস্তবায়নের দিক থেকেও সেটাকে মূল লক্ষবস্তু বানানো না হয়। তাই সঠিক ইসলামি শাসনব্যবস্থা সেটাই যা চিন্তাগত ও কর্মপন্থায় প্রতিটি ধাপে ইসলামের শিক্ষা এবং দিকনির্দেশনার অনুগামী হয়। আর তার কোনো শাখা ইসলামি বিধিবিধানের বিপরীত না হয়।

কুরআন ও সুন্নায় আইন শৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত যত নুসূস রয়েছে, সবগুলোর মূলকথা প্রায় এটাই।

ইসলাম ও গণতন্ত্র

ইসলামি শাসনব্যবস্থার এই দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার পর যখন আমরা তাকে গণতন্ত্রের সাথে তুলনা করি, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পর সাংঘর্ষিক, যা কখনো একত্র হতে পারে না। উভয়টির

মাঝে দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মপন্থা ও বাস্তবতার বিচারে এই পরিমাণ বৈপরিত্ব রয়েছে যে, যাকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কেননা ইসলামি শাসনব্যবস্থার, যাকে খিলাফত শব্দে ব্যক্ত করা হয়, মূল মাকসাদ হলো দীন কায়েম করা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের মাকসাদ এটা নয়। ফলে গণতান্ত্রিক অভিধানে দীনের পূর্ণ চিত্র তো শুরু থেকেই নেই। উক্ত লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী তো গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো, সামাজিক বিষয়াদি জনসাধারণের অধিকাংশের রায়ে পরিচালিত হবে। এর উপর কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা চলবে না, তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে, চাই তা দীন ও শরীয়ত অনুযায়ি হোক বা এর বিপরীত। খেলাফত ও ইসলামি শাসনব্যবস্থায় সর্বময় ক্ষমতা হয় দীন ও শরীয়তের, বিপরীতে গণতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতা হয় জনসাধারণের।

উভয়ের বৈপরিত্বের ধরন:

এই উভয় শাসনব্যবস্থার মাঝে মূলগত (জাওহারি) পার্থক্য রয়েছে। আর এটা কোনো সাধারণ পার্থক্য নয়, যাকে হালকা মনে করা হবে, আর উভয়ের মাঝে সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো অনুসন্ধান করে এই পার্থককে অগ্রাহ্য করা হবে। বরং বাস্তবতা হলো, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য শাখাগত বহু পার্থক্যকে অন্তর্ভূক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ সাধারণ প্রাণী ও মানুষের মাঝে সামান্য একটি 'আকল' তথা 'বিবেক'ই পার্থক্য। কিন্তু এই এক পার্থক্য শতশত শাখাগত বিষয়ে মিল থাকার চেয়েও ওজনদার ও ভারী। আর এই এক পার্থক্যের কারণে উভয়টির মাঝে নাম-ডাক, কাজ-কর্ম ও মান-মর্যাদায় এ পরিমাণ পার্থক্য তৈরী হয়ে গেছে, যার কারণে উভয়টি সম্পূর্ণ পৃথক দুটো বাস্তবতায় অবস্থান করছে। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি অধিকাংশ জিনিস উভয়ের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। ঠিক খিলাফত ও গণতন্ত্রের মাঝেও মৌলিক পার্থক্যের কারণে উভয়ের মাঝে পদে পদে

সংঘর্ষ ও বৈপরীত্বের তৈরি হয়, যার পরিণামে উভয় শাসনব্যবস্থা কখনো একসাথে চলতে পারে না। উভয়ের লক্ষ্যও ভিন্ন, কর্মপন্থাও ভিন্ন।

খ. খেলাফত ও গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক পার্থক্য

মৌলিক উদ্দেশ্যের এই একটি পার্থক্য যার কারণে বহু বিরোধ তৈরী হয়ে যায়। যার ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত হলো 'শাসক নির্বাচন পদ্ধতি'।

১. রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পার্থক্য ও নির্বাচনের কিছু ক্ষতিকর দিক

খিলাফত ব্যবস্থায় খলিফা ও রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি হলো, আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ (যোগ্য ও জাতীর দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ) কোনো সৎ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে জাতির নেতা হিসেবে নির্ধারণ করবেন। পক্ষান্তরে গনতন্ত্রে নির্বাচনের তুফান ছুটানো হয়। আর নির্বাচনের অবস্থান দীন-ইসলাম ও ইমান-তাকওয়ার জীবনের জন্য ঠিক তেমনই যেমন শহর ও বিভিন্ন জনবস্তির জন্য জন্য সুনামি ও তুফান। নির্বাচন চলাকালীন দিনগুলোতে পুরো দেশে মিথ্যা, ধোঁকা, ওয়াদা খেলাফি, চুক্তি ভঙ্গ, গিবত, অপবাদ আরোপ, ঘুষ আদান-প্রদান, সম্পদের অপচয়, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা, ছবির ছড়াছড়ি, মিথ্যা কসম, নামায কাজা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন দীনি ওয়াজিবাসমূহ ছেড়ে দেওয়া ও সামাজিক হুকুক বিনষ্ট করাসহ অসংখ্য প্রকারের গুনাহের প্রলয়ংকরী এক প্লাবন বয়ে যায়। যা সমাজের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের আঁচল দুর্গন্ধযুক্ত করে ফেলে। নির্বাচনের দিনগুলোতে পুরো দেশের আনাচে-কানাচে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিমাণ ও সে গুনাহের পুনরাবৃত্তির বিষয়টি যদি পূর্ণ সততা ও ইনসাফের সাথে লক্ষ করা হয়, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই দিনগুলো হলো পাপাচার ও অবাধ্যতার

ভরা মওসুম। কোনোরকম বাড়াবাড়ি ছাড়া এই কথা অবশ্যই বলতে হবে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনি দিলনগুলোর অনাচারের তুফানে লাখো অন্যায়-অপকর্ম সংঘটিত হয়।

শান্তি-নিরাপত্তা আর ফেতনা-ফাসাদের অর্থ:

এতদাসত্ত্বেও "নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতার পালাবদল"কে যদি গণতন্ত্রের শ্রেষ্টত্ব গণ্য করা হয় যেমনটা মুহতারাম লেখক বলেছেন, তাহলে বলতে হবে, এধরণের প্রবক্তাদের নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার মাপকাঠি সেটা নয়, যে মাপকাঠি একজন মুসলিমের হওয়া উচিৎ। দীন ও শরীয়তের ভাষায় ফেতনা-ফাসাদ শুধু যুদ্ধকেই বলা হয় না—যা থেকে বাঁচতে পারাকে শান্তি ও নিরাপত্তা বলা হবে। এটাতো কেবল বস্তুবাদি আর পশ্চিমা চিন্তাধারা। শরীয়তের আলোকে ফাসাদ হলো কুরআন-সুন্নাহর আইনের বিরুদ্ধাচারণ। চাই বাহ্যিকভাবে কোনো যুদ্ধই না হোক। একারণে কিছু লোক যদি সুদ, জুয়া ও পাপাচার ইত্যাদিতে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হয়, বাহ্যিকভাবে সে যতই শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হোক, শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটা ফাসাদ। ঠিক এর বিপরীতে আল্লাহর কোনো বান্দা যদি শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠার জন্য শরয়ী বিধিবিধানের আলোকে সশস্ত্র যুদ্ধ-জিহাদ করে, তাহলে বাহ্যিকভাবে এ যুদ্ধ যতই ফাসাদ মনে হোক না কেনো, শরীয়তের প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে এটাই আমান ও নিরাপত্তা।

ইমাম তবারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩১০ হি.) সূরা বাকারার এক আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন,

(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون)، هم المنافقون. أما"لا تفسدوا في الأرض"، فإن الفساد، هو الكفر والعمل بالمعصية. (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢٨٨/١، تحت سورة البقرة: ١١)

‘“আর তোমরা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ করো না” আয়াতে ফাসাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুফর ও যেকোনো গুনাহের কাজ।’

এরপর নিজস্ব সনদে হযরত রবী থেকে বর্ণনা করেন,

وحدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) يقول: لا تعصوا في الأرض (قالوا إنما نحن مصلحون) ، قال: فكان فسادهم ذلك معصية الله جل ثناؤه، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته، فقد أفسد في الأرض، لأن إصلاح الأرض والسماء بالطاعة. (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢٨٨/١، تحت سورة البقرة: ١١)

ঐসব (মুনাফিকরা) ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ ছড়ানোর মাধ্যম ছিলো আল্লাহর নাফরমানি। কেননা যারাই আল্লাহর নাফরমানি করে এবং গুনাহের আহ্বান করে তারাই মূলত যমীনে ফাসাদকারী। কারণ, আসমান ও যমিনের ইসলাহ ও সংশোধন আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই হয়।[2]

মাওলানা সূফি আবদুল হামিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ফাসাদ আর ইসলাহ দুটো বিপরীত বিষয়। মধ্যমপন্থা থেকে বের হওয়াকে ফাসাদ বলা হয়। অন্যায়ভাবে যুদ্ধের আগুন উসকে দেওয়া, ফেতনা তৈরি করা, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব, মুসলমানদের সাথে ধোঁকা, তাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া, প্রকাশ্যে পাপাচার করা, দীনের অসম্মান করা, শরীয়তের আইনের বিরোধিতা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডই হলো “ফাসাদ ফিল আরদ” তথা যমিনে ফেতনা-ফাসাদ করা। এসব লোকদের নিকট কল্যাণ আর ইসলাহ হলো শুধু আয়েশি জীবণযাপন। এরা আল্লাহর আইনকে পরিত্যক্ত করে রেখেছে, আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে কুফর-শিরকে জড়িত হচ্ছে, গায়রুল্লাহর ইবাদাত করছে, এটাই ফাসাদ। ইমাম তবারী এবং ইবনে কাসীর বহু তাফসির বিশারদদের থেকে বর্ণনা

[2] তাফসিরে তবারি ১/২৮৮

করেছেন, আসমান-যমিনের ইসলাহ কেবল আনুগত্যের মাধ্যমেই হতে পারে। আনুগত্য হবে তো আসমান যমিনের কার্যক্রম ঠিক থাকবে। যদি আল্লাহর আইন ও তার রাসূলের আনুগত্য না হয়, তাহলে যমিনে ফাসাদ ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর মুনাফিকরা এসবই করে বেড়াচ্ছে।'[3]

আল্লামা ইকবাল রহিমাহুল্লাহও এই সূক্ষ বিষয়টি এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন,

আল্লাহর থেকে দূরবর্তী করে দিলে শিক্ষাও ফেতনা
ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি আর জায়গা-জমিও ফেতনা
অন্যায়ভাবে উত্তোলিত হলে তলোয়ারও ফেতনা
তলোয়ারই বা কী; নারায়ে তাকবীরও ফেতনা

শান্তি-নিরাপত্তা আর ফেতনা-ফাসাদের এই মৌলিক চিন্তাটি বুঝার পর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রচলিত যে পদ্ধতি রয়েছে, তা শান্তিপূর্ণ নয় বরং বিশৃঙ্খলা আর ফিতনায় পূর্ণ। ফেতনা-ফাসাদের জয়জয়াকার। এতে যে পরিমাণ ফাসাদ হয় তা রাজতন্ত্রের ক্ষমতার পালাবদলের ফিতনা থেকেও কয়েকগুণ বেশি। অথচ রাজতন্ত্রের ক্ষমতার পালাবদলের জুলুম, বাড়াবাড়ি নিয়ে খুবই ঢাকঢোল পেটানো হয়! এবং সেটাকে খুবই তিরস্কারের সাথে দেখা হয়!!

২. শাসক নির্বাচনের মাপকাঠির ক্ষেত্রে পার্থক্য

খিলাফত ও গণতন্ত্রের মাঝে শাসক নির্ধারণের মাপকাঠিও ভিন্ন। খিলাফত ব্যবস্থায় খলিফা নির্ধারণের নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠি হলো, ব্যক্তি নেককার ও সৎ হওয়া, ভূখণ্ডের ব্যবস্থাপনা শরীয়ার আলোকে

[3] মাআরিফুল ইরফান ২/৭৫

পরিচালনার বুৎপত্তি জানা থাকা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে শাসন নির্ধারণের নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠি এটা নয়, বরং কোনো রাষ্ট্রে যদি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে সেখানের মাপকাঠি হলো বেশির থেকে বেশি জনগণের রায় মেনে চলা। তাদেরকে বস্তুবাদি দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে সন্তুষ্ট ও খুশি রাখা। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে নির্বাচনের নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠি হলো পশ্চিমা উপনিবেশ শক্তির জন্য সবচেয়ে উপকারী হওয়া ও তাদের ইশারা অনুযায়ী চলা। আর যেসব রাষ্ট্রে আর্থিক খিয়ানতের মহামারি ছড়িয়ে আছে, জনগনের পক্ষ থেকে ওখানকার নির্বাচন হলো, রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে যত বেশি সম্ভব তাদের নিজের ঝুলি পূর্ণ করা।

৩. নির্বাচনের সময়সীমা

নির্বাচনের সময়সীমার ক্ষেত্রেও উভয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। খলিফা নির্বাচন এমন কোনো নির্ধারিত সময়ের সাথে সিমাবদ্ধ নয় যে, সময় শেষ হয়ে গেলে বিনা কারণে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে; বরং খলিফা স্থায়ীভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকে। অবশ্য কোনো কারণে যদি সে খিলাফতের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে, তাহলে এর জন্যও একটি বিশেষ শরয়ী পদ্ধতি রয়েছে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তারপর ইচ্ছা হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় সে বরখাস্ত হয়ে যায়।

৪. নির্বাচন পরবর্তী সময়

নির্বাচন পরবর্তীতে খলিফা ও গণতান্ত্রিক শাসকের মাঝেও রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নতা। ইসলামি শাসনব্যবস্থার "আমীর" একথা মেনে চলতে বাধ্য যে, যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তা কুরআন-সুন্নাহর দাড়িপাল্লায় রাখবে, পরামর্শের উপযুক্ত বিষয়াগুলোতে আহলে হল ওয়া

আকদ ও শুরা কাউন্সিলের সাথে মাশওয়ারা করবে। এরপর উদ্ভুত সমস্যার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর গণ্ডিতে থেকে যে সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র ও জাতির জন্য অধিক উপকারী প্রতিয়মান হয়, তাই কার্যকর করবে। এর বিপরীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ হলো, যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে পার্লামেন্টের সামনে তা পেশ করবে, পার্লামেন্ট সদস্যগণ তা নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা করে অধিকাংশ সদস্য যে রায় পেশ করবে সেটাই মানতে বাধ্য থাকবে। এতে না কুরআন-সুন্নাহর গণ্ডিতে থাকা জরুরী, আর না অধিকাংশের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রায়ের কোনো ধর্তব্য আছে।

৫. শুরা ও পার্লামেন্টের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামি শুরাব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনার পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে একই রকম মনে হয়—শুরাব্যবস্থায় সকলের রায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আর গণতন্ত্রেও একই নিয়ম। এই বাহ্যিক সাদৃশ্যতা দেখে নিকট অতিত ও সমকালীন অনেকেই ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো উভয়টি এক বিষয় নয়, বরং উভয়ের মাঝে রয়েছে সম্পূর্ণ বৈপরিত্বের সম্পর্ক। কারন-

ক. শুরাব্যবস্থায় যেসকল আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের রায় নেয়া হয়, তাদের নির্বাচন শুধু বুদ্ধিমত্তা ও অবিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নয়, বরং ইমান ও তাকওয়ার মানদণ্ডে যাচাই করা হয়। পক্ষান্তরে পার্লামেন্ট সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, বরং সাধারণভাবে সম্পদশালী, পুঁজিবাদি, জালেম ও জমিদার ধরনের লোকজনই এই স্তরে পৌঁছতে পারে।

খ. শুরা সদস্যগণ রায় পেশ করার ক্ষেত্রেও স্বাধীন নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত সীমারেখা মেনে ও গণ্ডির ভেতরে থেকে

রায় পেশ করতে পারেন। এর বিপরীতে পার্লামেন্টের সদস্যদের মৌলিকভাবে এধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। তাদের যদি কোনো বিষয়ের পাবন্দি করতেই হয় তাহলে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় আইনের, যার সার্বভৌমত্বের শপথ করে তারা পার্লামেন্টে পৌঁছেছে, তার পাবন্দি করতে হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে স্বয়ং সে নিজেও এই আইনকে পর্যন্ত সংশোধন করতে পারে। আমাদের পাকিস্তানেও দুই তৃতীয়াংশ তথা অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে আইন সংশোধন করতে পারে।

গ. আমীরুল মুমিনীন বা খলিফা সর্বাবস্থায় শুরার রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য নয়। কোনো সময় যদি তিনি শুরার রায়কে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত মনে করেন, কিংবা তার তুলনায় অন্য কোনো সিদ্ধান্তকে কুরআন-সুন্নাহ এবং জনসাধারণের উপকার ও কল্যাণের অধিক কাছাকাছি মনে করে, তাহলে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর যখন যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেসময় হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ সমস্ত শুরা সদস্যদের রায় এর বিপক্ষে ছিলো, এই ভয়াবহ নাযুক পরিস্থিতিতে তারা যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু রাসূলের খলিফা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর এই যুক্তি পেশ করেছেন যে, আমার নিকট এসকল লোক অন্যান্য মুরতাদদের মতোই মুরতাদ। যার বিধান হলো, হয়তো পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে, অথবা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। এমনিভাবে হযরত আবু বকরসহ অন্যান্য খলিফাগণও অধিকাংশ শুরা সদস্যের রায় অনুযায়ী চলা আবশ্যক মনে করতেন না।

কুরআন মাজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে,

﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾

কাজের ব্যাপারে তাদের সাথে মাশওয়ারা করুন। অতপর যখন সে কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলবেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের পছন্দ করেন।[4]

এটা তো গেলো ইসলামি শুরায়ী নেযামের কথা। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার প্রধান অধিকাংশের রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করতে বাধ্য থাকেন। যদি তার কোনো সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের বিপরীত হয়, তাহলে তার এ সুযোগ নেই যে, সে অধিকাংশের মতামতকে বাদ দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

অধিকাংশের রায় সম্পর্কিত একটি আপত্তি ও তার জবাব

অধিকাংশের রায়ের বিষয়ে একটি আপত্তি এটা উঠানো হয় যে, ব্যক্তিগত রায় অথবা স্বল্পসংখ্যকদের মতামতের বিপরীতে অধিকাংশের মতামত বাস্তবেই অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিৎ, কারণ যখন একদিকের সদস্য সংখ্যা অধিক হবে, তখন অবশ্যই চিন্তা ও ভাবনার কিছু দিক এমন থাকবেই, যেগুলোর প্রতি অপরপক্ষের কোনোনা কোনো চিন্তাগত উপলব্ধি রয়েছে। একারণে অধিকাংশের রায়ের অনুসরণকে গণতন্ত্রের ত্রুটি ও অপূর্ণাঙ্গতা নয় বরং শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা হিসেবে গণ্য করা উচিৎ।

ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে একথা খুবই যুক্তিসংগত ও ভাবগম্ভীর মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো একথা একেবারেই অবাস্তব। সংখ্যাধিক্যতা না যুক্তির বিচারে কোনো কিছুর সঠিককতা বা সত্য হওয়ার মাধ্যম হতে পারে, আর না শরীয়াহর আলোকে এটা কোনো হক ও সত্যের

[4] আলে ইমরান: ১৫৯

মাপকাঠি হতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, পৃথিবীতে সাধারণত জ্ঞানীদের তুলনায় নির্বোধ ও স্বল্প বুদ্ধির লোকদের আধিক্য বেশি। কোথাও যদি কৃত্তিমভাবে জ্ঞানীদের একত্রও করা হয়, তাহলেও তাদের মধ্যে সুস্থ মস্তিষ্ক ও পূর্ণ জ্ঞানীর সংখ্যা কমই হবে, যাদের আকল ও চিন্তার আয়না লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতির চিহ্ন থেকে মুক্ত হয়। একারণে কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন নুসূসে এ কথার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সূরা আনআমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾

আর আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মান্য করেন, তবে ওরা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেবে। ওরা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং ওরা কেবল অনুমানের ঘোড়া ছোটায়।[5]

এর মানে এটা নয় যে, অধিকাংশের সাথে শুধু শুধু দুশমনি করা হবে। আবার অধিকাংশের মত কোনো স্থানেই ধর্তব্য নেই বিষয়টি এমনও নয়। ইসলামে ক্ষেত্রবিশেষ অধিকাংশের মতামতকেও একটা সীমা পর্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ হানাফি ফকিহগণও কোনো কোনো মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় প্রাধান্য বক্তব্য কোনটা হবে তা নির্ণয়ে কিছু কিছু সূরতে অধিকাংশের মতামতের ধর্তব্যের কথা বলেছেন। কিন্তু এর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্টের উপর ভিত্তিশীল গণতান্ত্রিক দর্শনের পক্ষে প্রমান পেশ করা ধোঁকাপূর্ণ। কেননা সেখানে ইখতেলাফ ফুকাহয়ে কেরামের মাঝে নব উদ্ভুত কোনো মাসয়ালার শরয়ী হুকুমের ব্যাপারে ছিলো। আর এককথা স্পষ্ট যে, ফকিহগণের ইখতেলাফ ইজতেহাদি নির্ভর হয়, যেখানে প্রত্যেক পক্ষই কুরআন-সুন্নাহর

[5] সূরা আনআম : ১১৬

দলিলসমূহের মধ্যে নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী গবেষণা করে শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে থাকেন। একারণে মুজতাহিদগণ আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় প্রতিদান ও সাওয়াব পেয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে পার্লামেন্ট সদস্যদের এটা মাকসাদও নয় আর তারা সাধারণত এধরণের ঝুকিপূর্ণ কাজের যোগ্যতাও রাখে না।

বৈপরিত্বের মাপকাঠি

দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরিত্বের বড় একটি দিক হলো উভয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা ভিন্ন হওয়া। ফিকহি ও বর্তমান পার্লামেন্টের পরস্পর মতানৈক্যের যোগসূত্রটা এমনই যে, উভয়টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা ভিন্ন ভিন্ন। ফিকহি ও ইজতিহাদি মতানৈক্যের মাকসাদ আল্লাহর হুকুম পর্যন্ত পৌঁছা। আর কর্মপন্থা হলো, যেকোনো নব উদ্ভুত মাসয়ালা সামনে আসলে কুরআন-সুন্নাহর নুসূসে তার সমাধান অনুসন্ধান করা। যদি পাওয়া যায় তাহলে সেটা গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় ইজমায়ে উম্মতের আলোকে তার সমাধান খোঁজা হবে। আর এখানেও পাওয়া না গেলে বিশেষ ইলমি-আমলি যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে এর শরয়ী সমাধান জানার চেষ্টা করবেন। বিপরীতে পার্লামেন্টের মতানৈক্য শরয়ী বিধান পর্যন্ত পৌঁছা কখনোই উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রতিটি পক্ষ নিজস্ব সংবিধান ও রীতিনীতির আলোকে যেটাকে উপযুক্ত মনে করে, সেটাকে সাব্যস্ত করা ও বিল পাশ করানোই হয় মাকসাদ। আর তাদের কর্মপন্থায় কুরআন-সুন্নাহর কোনো পরোয়া করা হয় না, বরং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার এই সুস্পষ্ট পার্থক্য ও বৈপরিত্ব সত্তেও উভয়টিকে এক মনে করা এবং পার্লামেন্টারি মতানৈক্যকে ফিকহি মতানৈক্যের সাথে তুলনা করা কোনোভাবেই সঠিক নয়।

গ. খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার দলিল-প্রমাণ

"খেলাফত সংক্রান্ত মাসায়েল", এই বিষয়ে ইলমে কালামের কিতাবসমূহে সতন্ত্র আলোচনা রয়েছে। যেখানে এর হুকুম, দলিল-প্রমাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এখানে সেসকল আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং; এখানে খেলাফতের আবশ্যকীয়তা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু দলিল-প্রমাণ পেশ করা হবে।

আল্লামা তাফতাযানি রহিমাহুল্লাহ 'মাকাসিদুত তালিবীন' নামক কিতাবে এই সংক্রান্ত বেশকিছু দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তার আলোকে এখানে ইষৎ সংযোজনসহ কিছু দলিল উল্লেখ করবো।

ক. বহু হাদিস শরীফে বিভিন্ন আঙ্গিকে খেলাফতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি ইমামের হাতে বাইয়াত দেওয়া ব্যতিত মারা গেলো, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করলো। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ইমাম ও শাসকদের নির্দেশ মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, এমনকি জায়েয বিষয়াদিতে খলিফার আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করা হয়েছে। এসকল বক্তব্যের সমষ্ঠি এই কথাই প্রমাণ করে যে, ইমাম নিয়োগ দান মুসলমানের উপর ফরজ।

খ. ইজমায়ে উম্মত। উম্মাহর উলামায়ে কেরাম এব্যাপারে একমত যে, মুসলমানদের এমন একজন আমীর থাকা আবশ্যক, যিনি তাদের মাঝে শরয়ী বিধিবিধান বাস্তবায়ন করবেন। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম এবিষয়ে

একমত ছিলেন, এবং এর গুরুত্ব ও আবশ্যকিয়তার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরপর রাসুলের কাফন-দাফনের পূর্বেই এই মহান বিধান বাস্তবায়ন করেন।

গ. ইসলামের বহু ওয়াজিব ও ফরজ বিধান এমন রয়েছে, যেগুলো খলিফা ছাড়া বাস্তবায়ন করা যায় না। যেমন, হুদুদ-কিসাস বাস্তবায়ন ও ইসলামি ভূখণ্ডের সীমান্ত সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

ঘ. সাধারণত সব কল্যাণ অর্জন করা ও সব ক্ষতি থেকে বাঁচা জরুরি নয়। কিন্তু কিছু কল্যাণ অর্জন করা এবং কিছু ক্ষতি থেকে বাঁচা আবশ্যক। খেলাফতের সাথে এমন কিছু জরুরি মাসলাহাত সম্পৃক্ত যেগুলো অর্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে আবশ্যক। এমনিভাবে এই খেলাফতের ছায়াতলে এমন অনেক অনিষ্ট ও ফেতনা থেকে বাঁচা যায়, যেগুলো থেকে বাঁচা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি।

এসব দলিল-প্রমাণের কারণে প্রতি যুগের প্রায় সকল আহলে ইলম এব্যাপারে একমত যে, খেলাফত কায়েম করা মুসলমানের উপর ফরজ। আর উম্মতের উলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে একমত হওয়া আপন জায়গায় স্বতন্ত্র দলীলের মর্যাদা রাখে।

এমনিতে তো ইমামত ও খেলাফত বিষয়ক আলোচনা ইলমে কালাম ও ইসলামি সিয়াসাত এই দুই শাস্ত্রের স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়। উভয় শাস্ত্রের উৎসগ্রন্থে খেলাফত ও ইমামত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো সবিস্তারে ও সুস্পষ্টভাব উল্লেখ আছে। সহজতার জন্য উদাহরণস্বরূপ এখানে কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫০৫ হি.) বলেন,

نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعا، وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام. ... فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعا، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك. (الاقتصاد في الاعتقاد ص١٢٧، القطب الرابع، الباب الثالث: في الأمامة)

প্রথম মুকাদ্দামা (premise), দীনের শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা করা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য। আর এটা এমন অকাট্ট মুকাদ্দামা যে বিষয়ে কারো ইখতিলাফের কল্পনাও করা যায় না। দ্বিতীয় মুকাদ্দামা, দীনি শৃঙ্খল কেবল তখনই বহাল রাখা সম্ভব, যখন আনুগত্যযোগ্য কোনো নেতা বিদ্যমান থাকবেন। এই দুই মুকাদ্দামা থেকে এই দাবির সঠিকতা প্রমাণিত হয়—খলিফা নির্ধারণ করা একটি আবশ্যকীয় বিষয়।... সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, দুনিয়ার শৃঙ্খলার জন্য একজন শাসক অপরিহার্য। আর দুনিয়ার স্থিতিশীলতা দীনের শৃঙ্খলার জন্য অপরিহার্য। আর দীনের শৃঙ্খলা হলো আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য। আর এটি নবীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব, একজন ইমাম বা শাসক নিযুক্ত করা শরিয়তের অন্যতম জরুরি বিষয়, যা পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই।[6]

আল্লামা আমিদি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৬৩১ হি.) বলেন,

مَذْهَب أهل الْحق من الإسلاميين أَن إِقَامَة الإِمَام واتباعه فرض على الْمُسلمين شرعا لَا عقلا وَذهب أَكثر طوائف الشِّيعَة إِلَى وجوب ذَلِك عقلا لَا شرعا وَذهب بعض

[6] আল ইকতেসাদ ফিল ইতেকাদ পৃ. ১২৭

الْقَدَرِيَّة والخوارج إِلَى أَن ذَلِك لَيْسَ وَاجِبا لَا عقلا وَلَا شرعا... قَالَ أهل الْحق الدَّلِيل الْقَاطِع على وجوب قيام الإِمَام واتبعاه شرعا مَا ثَبت بالتواتر من إِجْمَاع الْمُسلمين فى الصَّدْر الأول بعد وَفَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على امْتنَاع خلو الْوَقْت عَن خَلِيفَة وَإِمَام. (غاية المرام في علم الكلام ص ٣٦٤، الطّرف الأول فى وجوب الإماكة وَمَا يتَعَلَّق بهَا.)

আহলে হকের মাযহাব হলো, ইমাম নির্ধারণ করা এবং তার আনুগত্য করা মুসলমানদের উপর শরীয়ত কর্তৃক ফরজ। শুধু যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ফরজ এমন নয়। তবে শিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশের মাযহাব হলো, এটা শরয়ী ফরজ নয় বরং আকলি ফরজ। আর কিছু কাদেরিয়্যাহ ও খারেজিদের মাযহাব হলো, ইমাম নির্ধারণ করা শরয়ী ফরজও নয় আকলি ফরজও নয়। আহলে হক নিজেদের মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করে থাকেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলের ইন্তেকালের পর মুসলমানদের এ ব্যাপারে ইজমা তথা ঐক্যমত হয়েছে যে, এমন কোনো সময় অতিবাহিত করা উচিত নয় যেখানে মুসলমানদের কোনো ইমাম ও খলিফা বিদ্যমান না থাকে। [7]

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে খালদুন রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৮০৮ হি.) বলেন,

ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. (تاريخ

[7] গায়াতুল মারাম ফি ইলমিল কালাম, পৃ. ৩৬৪

ابن خلدون ١/ ٢٣٩، (المقدمة) الباب الثالث، الفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه.)

ইমাম নির্ধারণ করা আবশ্যক, আর এর আবশ্যকিয়তা সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত হযরত আবু বকর রাযি. এর হাতে বায়াত দিয়েছিলেন এবং নিজেদের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আর এ বিষয়টা পরবর্তী যুগেও চলমান ছিলো। উম্মতকে কোনো যুগেই বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার মধ্যে ফেলে রাখা হয়নি।[৪]

বিশিষ্ট ফকিহ ইমাম কাসানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫৮৭ হি.) বলেন,

نصب الإمام الأعظم فرض، بلا خلاف بين أهل الحق، ولا عبرة - بخلاف بعض القدرية -؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ولمساس الحاجة إليه؛ لتقيد الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالم، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد، وغير ذلك من المصالح التي لا تقوم إلا بإمام. (بدائع الصنائع ٢/٧، كتاب آداب القاضي، بيان فرضية نصب القاضي)

ইমাম নির্ধারণ করা ফরজ, আর এ ব্যাপারে আহলে হকের কারো মধ্যে কোনো ইখতেলাফ নেই। কাদেরিয়াদের মধ্য থেকে যে কয়জন ভিন্নমত পোষণ করেছে, তার কোনো ধর্তব্য নেই, কারণ এব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইজমা হয়ে গেছে। বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা, জালেমের হাত থেকে মাজলুমকে রক্ষা করা এবং ঐসব ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করা যেগুলো ফেতনা-ফাসাদের গোঁড়া, এগুলোর জন্য উম্মত

[৪] তারিখে ইবনে খালদুন, ১/২৩৯

একজন খলিফার মুখাপেক্ষী। এছাড়াও বহু মাসলাহাত এমন আছে যেগুলো খলিফার মাধ্যমেই সম্ভব।[9]

ইজমা সংক্রান্ত সমাকালীন সময়ে সুবিস্তারিত লিখিত একটি কিতাব হলো "মাউসুয়াতুল ইজমা ফিল ফিকহিল ইসলামি"। উক্ত কিতাবে রয়েছে,

أجمع سلف الأمة، وأهل السنة، وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب الإمام -أي توليته على الأمة- واجب على المسلمين شرعًا لا عقلًا فقط،... قال ابن حزم: "اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج، على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام اللَّه، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة... وقول هذه الفرقة ساقط، يكفي من الرد عليه وإبطاله: إجماع كل من ذكرنا على بطلانه، والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمام" وقال القرطبي: "ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما رُوي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتَّبعه على رأيه ومذهبه". (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ٥٧/٥، مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية، الباب الأول، المبحث الثالث مشروعية الإمامة)

আহলুস সুন্নাহের পূর্ববর্তী সকলের এবং অন্যান্য ফিরকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের এই বিষয়ে ইজমা হয়েছে যে, মুসলমানদের উপর একজন ইমামের নির্ধারণ করা আবশ্যক। এই দায়িত্ব শুধুই আকলি দলিলের আলোকে নয় বরং শরয়ী দলিলের আলোকে প্রমাণিত। ... ইবনে হাজম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আহলুস সুন্নাহ, মুরজিয়া, শিয়া এবং খারেজিদের সকল ফিরকা খেলাফত আবশ্যক এই বিষয়ে ঐক্যমত

[9] বাদায়ে সানায়ে, ৭/২

হয়েছে। এবং এই বিষয়েও একমত যে, উম্মতের উপর ন্যায়পরায়ন ইমামের আনুগত্য করা আবশ্যক যিনি আল্লাহর বিধিবিধান বাস্তবায়ন করবে এবং মুসলমানদের ঐ সকল বিধিবিধান দিয়ে পরিচালনা করবে যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন। এই বিষয়ে খারেজিদের নাজদাত নামক একটি দল মতবিরোধ করেছে, তাদের বক্তব্য হলো, মানুষের উপর ইমাম নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়।... এদের এই বক্তব্যের কোনো ধর্তব্য নেই। এই বক্তব্যের ভ্রান্তি ও খণ্ডনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ যে, পুরো উম্মতে মুসলিম এই বিষয় একমত যে, ইমাম নির্ধারণ করা ফরজ। কুরআন ও সুন্নাহতে ইমাম নির্ধারণ আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে দলিল-প্রমাণ অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইমাম নির্ধারণের বিষয়ে উম্মতের মধ্যে না কোনো ইখতিলাফ রয়েছে, না কোনো ইমামদের মধ্যে। তবে আসম নামক এক ভ্রান্ত ব্যক্তি থেকে ভিন্ন মত রয়েছে। আর সে (নামের মত) শরীয়তের ব্যাপারেও আসম (বধির)। তেমনি ঐ ব্যক্তিরাও যারা তার মতকে অনুসরণ করেছে।"[10]

এর কয়েক পৃষ্ঠা পর "ইমাম" এই পরিভাষার মর্ম ও হুকুম সংক্রান্ত আলোচনায় উক্ত কিতাবে বলা হয়,

ونصب الإمام في الاصطلاح: اختيار خليفة للمسلمين نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا؛ ليقيم فيهم أحكام الله تعالى، ويسوسهم بأحكام الشريعة، وتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخلافة. وبهذا المعنى فإن نصب الإمام واجب بإجماع العلماء. (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ٦٨/٥، مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية، الباب الأول، المبحث الثالث، الفصل الأول، وجوب نصب الإمام)

[10] মাউসুয়াতুল ইজমা ফিল ফিকহিল ইসলামি ৫/৫৭

পারিভাষিক অর্থে ইমাম নির্ধারণের মর্ম হলো, মুসলমানদের জন্য এমন খলিফা নির্ধারণ করা যিনি দীন রক্ষা ও দুনিয়ার পরিচালনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হবে যে, খলিফা মানুষদের মাঝে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে এবং শরয়ী বিধানের আলোকে তাদেরকে পরিচালনা করবে। যাতে এর মাধ্যমে মুসলমানদের ঐক্য হয় এবং খিলাফতের বিধিবিধানগুলো বাস্তবায়িত হয়। আর উম্মতের উপর সকল আলেমদের ঐক্যমতে একজন ইমাম নির্ধারণ করা ওয়াজিব তা এই উপরোক্ত অর্থে।[11]

এসকল বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইমামত ও খেলাফত কায়েম করা একটা শরয়ী দায়িত্ব। যদিও এব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে যে এই দায়িত্ব কী শুধু আকলী দলীলের আরোপিত, না নকলী দলীলের মাধ্যমে। কিন্তু উভয় পক্ষের নিকটই তা ওয়াজিব। আবু বকর আসমসহ যারা এটাকে গোড়া থেকেই ওয়াজিব বলেন না, উপরোক্ত প্রমাণাদির সামনে তাদের মতামতের কী ধর্তব্যই আর রয়েছে! স্বয়ং তাদের বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, আবশ্যক হওয়া না হওয়া বিষয়ে তাদের এই মতানৈক্য শুধু তাত্ত্বিকতার মাঝেই সীমাবদ্ধ। অথবা তাদের দাবি অনুযায়ী কেবল মাসলাহাতের ভিত্তিতে এ মতবিরোধ হয়েছে, কার্যকরণের ক্ষেত্রে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

ইবনে খালদুন রহিমাহুল্লাহ আসম ও কতক খারেজিদের মত উদ্ধৃতি করে লেখেন তাদের নিকট খলিফা নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক নয়। তিনি লেখেন,

[11] মাউসুয়াতুল ইজমা ফিল ফিকহিল ইসলামি ৫/৬৮

وقد شذّ بعض النّاس فقال بعدم وجوب هذا النّصب رأسا لا بالعقل ولا بالشّرع منهم الأصمّ من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم، والواجب عند هؤلاء إنّما هو إمضاء الحكم الشّرع فإذا تواطأت الأمّة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه وهؤلاء محجوجون بالإجماع. والّذي حملهم على هذا المذهب إنّما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتّغلّب والاستمتاع بالدّنيا لمّا رأوا الشّريعة ممتلئة بذمّ ذلك والنّعي على أهله ومرغّبة في رفضه. (تاريخ ابن خلدون ٢٤٠/١، (المقدمة) الباب الثالث، الفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه.)

কতক লোক বিচ্ছিন মত গ্রহণ করেছেন যে, খলিফা নিয়োগ দেওয়া উম্মতের উপর আবশ্যক নয়, শরয়ী দলিলের আলোকেও নয়, আকলি দলিলের মাধ্যমেও নয়। এদের মধ্যে একজন হলো মুতাজিলি মতাদর্শের আসম। আর কতক খারেজি ফিরকার মতও এমনই। তাদের বক্তব্য হলো, মানুষের উপর শুধু শরয়ী বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। উম্মত যখন ন্যায়পরায়নতা ও আল্লাহর বিধানের বিষয় একমত হবে তখন আর একজন ইমাম নির্ধারন করা আবশ্যক হবে না। তাদের বিপরীত উম্মতের ইজমার মত শক্তিশালী দলিল রয়েছে। তাদের এই মত গ্রহণ কারণ হলো, যাতে বাদশাহদের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে পারে।[12]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উম্মতে মুসলিমার উপর একটি সম্মেলিত ফরজ। এটি অন্যান্য ফরজের মত শুধু সাধারণ ফরজই নয়, বরং আরো অসংখ্য ফরজবিধান এই এক ফরজের সাথে সম্পৃক্ত। যেগুলো খেলাফতের অধিনস্ততা ব্যতিত যথাযথভাবে পূর্ণ করা খুবই কঠিন। একারণে অন্যান্য সাধারণ ফরজের

[12] তারিখে ইবনে খালদুন ১/২৪০

তুলনায় এটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলক একটি ফরজ। যা বাস্তবায়নে অলসতা করার কোনো সুযোগ নেই। হযরত সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা থেকে এই বিষয়টি অনুধাবন করা যায় যে, রাসূলের ইন্তেকালের ন্যায় ভয়াবহ দূর্ঘটনা, পরবর্তী দু:খ ও পেরেশানির যে সয়লাব ছিলো, এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা এ মহান জিম্মাদারী আদায়ে বিলম্ব করেননি, এমনকি রাসূলের কাফন-দাফনের পূর্বে এ ফরজ দায়িত্ব আদায়কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পশ্চিমা শক্তির লড়াই

ইসলাম বিরোধী শক্তির কছে এ রহস্য গোপন নেই যে, খেলাফতই এক এমন ছাতা যার ছায়াতলে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং এক ফিকর ও এক পরিবার হয়ে থাকবে। এবং এই মমতাময় ছায়ায় ইসলামের সন্তানগণ সুসংহত ও দিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এজন্যই ওরা এই ফরজের বিরুদ্ধে তীর-তলোয়ারের দূর্গম পথ বেঁচে নেওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনও চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমারা সর্বাত্মক এই প্রচেষ্ঠা করে গেছে বরং আজও ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—খেলাফত প্রতিষ্ঠার এই মহান ফরজ বিধানের অনুভূতিও যেনো উম্মাহর হৃদয় থেকে বিদায় নেয়। মুসলিমদের দিল ও অন্তর থেকে এ অনুভূতি দূর হয়ে গেলে এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ও প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কী অর্থ আর থাকবে!

আর একাজে মুসলিম সন্তানদের মধ্য থেকেও কিছু সদস্য—বুঝে হোক বা না বুঝে—পশ্চিমাদের উপকারে এসেছে। যারা ইসলামি সিয়াসাত ও খিলাফতের বিরদ্ধে লিখিত বা মৌখিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এর বড় একটি উদাহরণ হলো, মিসরের শায়খ আলি আব্দুর রাযযাক, যিনি "আলইসলাম ও উসুলুল হিকাম" নামক বই লেখে একথা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন যে, "শাসনব্যবস্থা ও খেলাফত, শরীয়তের

দৃষ্টিতে জরুরি ও আবশ্যক কিছু নয়, আর ইসলাম খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেয়নি"। এ কিতাবের বদৌলতে মিসরের ইলমি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা তৈরি হয়েছিলো। প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তানে কয়েক বৎসর পূর্বে মুহতারাম জাবেদ আহমদ গামেদী সাহেব 'দৈনিক জংগ' পত্রিকায় একটি কলাম লিখেছিলেন, যার মূলকথা হলো, "রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম হয় না, আর মুসলমানদের উপর এধরণের কোনো জিম্মাদারি নেই, সে যমিনে ইসলামি খেলাফতব্যবস্থা কায়েম করবে"। একজন সাধারণ পাঠক লেখাটি পড়ে এটাই বুঝবে যে, আধুনিক গণতন্ত্রই হলো ইসলামি শাসনব্যবস্থার উন্নত, কার্যকরী ও উপকারী রূপ।

এধরণের চিন্তাবিদদের মধ্য থেকে যারা দীনি চিন্তা-ফিকিরের নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন, বা পাঠকদের জযবা ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন তারাও এই সমাধানই দিয়ে থাকেন যে, গণতান্ত্রিক সিস্টেমের ভেতরে থেকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এই দাবির জন্য তারা মত প্রকাশে স্বাধীনতা, সমতা এবং গণতন্ত্রের অন্যান্য শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা শুরু করেন যে, যেনো এসব শ্রেষ্ঠত্ব অন্যকোনো শাসনব্যবস্থায় থাকতেই পারে না, আর না এগুলো ছাড়া কোনো শাসনব্যবস্থা কায়েম থাকতে পারে।

অথচ বাস্তবতা হলো, যদি গণতন্ত্রের স্বরূপ, এর ইতিহাস ও প্রভাবসমূহের উপর প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে ও আলোকিত মন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই শাসনব্যবস্থা "তীহ মরুভুমি"-এর বাস্তব নমুনা এবং তারই নতুন সংস্করণ। যাকে সেসব লোকেরাই পৃথিবীতে প্রচলন ঘটিয়েছে, যারা স্বয়ং "তীহ মরুভুমিতে" জীবণযাপনের তিক্ত অবিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলো।

ইসলামি বিশ্বের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবস্থাসমূহের ব্যাপারে অবগত ব্যক্তিদের নিকট এটা অস্পষ্ট নয় যে, সমতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি যেসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ডাক-ঢোল পেটানো হয়, সেগুলো ততক্ষণই ধর্তব্য হয়, যতক্ষণ তা ইসলাম ও ইসলামি আইনের বিপক্ষে থাকে। যেখানে এসব দর্শনের ভিত্তিতে বাস্তবেই কোনো ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, সেখানে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রয়োগ ও কূটকৌশলের জোরেই ধর্মীয় শক্তিকে উৎখাত করা হয়।

আমরা কারো উপর বিনা কারণে কোনো মন্দ ধারণা করছি না, বরং এই ধারণাই করি যে, একজন মুসলমান যেকোনো কাজ নেক নিয়তেই করে থাকেন। বিশেষকরে ওলামায়ে কেরাম যখন কোনো বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করেন, তখন দীনের খেদমত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জযবা নিয়েই কাজ করেন। কিন্তু এথেকে এই বিষয়ে বিস্মৃতি হলে চলবে না, আলোচনা-পর্যালোচনারও একটা সীমারেখা ও কর্মপন্থা হওয়া জরুরী। অসহায় উম্মতের বর্তমান দুঃখজনক অবস্থায় সর্বসম্মত ইজমায়ি মাআয়েলগুলো নিয়ে নতুন গবেষণার বিষয়বস্তু বানানোর দিন শেষে কী প্রয়োজন? আর যদি এসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়েও থাকে, তবুও ভাসা ভাসা অধ্যায়ন আর স্থুল প্রমাণাদির শক্তির জোরে সর্বোসম্মত মাসয়ালাগুলো চর্চার নামে এমনভাবে উপস্থাপন করার কী বৈধতা হতে পারে, যার ফলে পাঠক সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়ে পড়ে?

ঘ. একটি আপত্তি ও তার জবাব

খেলাফতের প্রতিষ্ঠার ফরজ দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু মহল থেকে খুব জোরেশোরে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, হুদুদ-কিসাস ইত্যাদি যত ধরণের ফরজ বিধান খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত এবং এর উপর

মওকুফ, তার যিম্মাদারী উম্মতের উপর এখন অর্পিতই হয়না, তাহলে এসব ফরজ দায়িত্ব পালন করার জন্য কিভাবে খেলাফত কায়েম করাকে ওয়াজিব বা ফরয সাব্যস্ত করা যেতে পারে? উদাহরণস্বরূপ তারা বলেন, "নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর কিছু অংশ যাকাত দেওয়া ফরজ, কিন্তু ফরজে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোনো ব্যক্তি বাস্তবে নেসাব পরিমাণের মালিক হবে। শুধু এই ফরজ আদায় করার জন্য নেসাব পরিমাণ সম্পদ উপার্জন করা জরুরি নয়"।

কিন্তু এই আপত্তির বাস্তবতা এক স্থুল সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা এর ভিত্তি হলো এ কথার উপর-

১. শরীয়ত তো 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়নি, বরং কিছু ফরজ বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছে, যেগুলো খেলাফত প্রতিষ্ঠা পরবর্তী উম্মতের উপর অর্পিত হয়।

২. এই ওয়াজিবগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়নি, বরং খেলাফত ব্যবস্থার উপর মওকুফ রাখা হয়েছে যে, যদি কখনো তোমাদের ঝুলিতে খিলাফাতের চাবি অবতীর্ণ হয়, তখন এসব ওয়াজিবাতের প্রতি যেনো লক্ষ্য রাখা হয়।

অথচ এ উভয় ধারণাই ভুল। খেলাফত কায়েম করা যদিও শরীয়তের মূল মাকসাদ নয়। কিন্তু কিছু ওয়াজিব ও ফরজের বাস্তবায়নের ভিত্তি হওয়ার কারণে 'খেলাফত' একটি স্বতন্ত্র ফরজ হয়ে গেছে। যার একটি দলিল তো হলো ঐ সকল নসসমূহ যেখানে দীন প্রতিষ্ঠা করাকে ফরজ বলা হয়েছে। আর পুরো দীনের প্রতিষ্ঠা খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভবই নয়। এবং যুক্তির আলোকে কোথাও এটা বাস্তবায়ন হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলিল ঐ সমস্ত নসসমূহ যেগুলো সংশ্লিষ্ট

বিষয়ে একদম সুস্পষ্ট। উদাহরণত, সহিহ মুসলিমে হযরত নাফে রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে,

عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. (صحيح مسلم برقم:١٨٥١، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة)

ইয়াযিদের শাসনামলে যখন 'হাররা'র দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. আবদুল্লাহ বিন মুতী'র নিকট গিয়ে বললেন, আমি বসার জন্য তোমার নিকট আসিনি, বরং তোমাকে একটি হাদিস শোনানোর জন্য এসেছি। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (খলিফার) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে রাখে, সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে এ ব্যাপারে কোনো প্রমান থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার কাঁধে কোনো খলিফার প্রতি বাইয়াত ছিলো না, তাহলে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো।[13]

এই রেওয়ায়েতের দ্বিতীয় অংশ এব্যাপারে একেবারে স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি কোনো ইমামের প্রতি বাইয়াত ছাড়া মৃত্যু বরণ করলো, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করেছে। উসূলীভাবে কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে জাহিলিয়াতের বিষয় আখ্যা দেওয়া উক্ত বিষয়টির নিন্দা ও নিষিদ্ধতার

[13] সহিহ মুসলিম , বর্ণনা নং ১৮৫১

প্রমাণ বহণ করে। কেননা জাহিলিয়াত ইসলামের এমন বিরুদ্ধ শক্তি যাকে মূলৎপাটন করার জন্যই ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছে।

এছাড়াও হযরত সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীনের ইলমী ও আমলী ভাবে উক্ত বিষয়ে ঐক্যমত হওয়া এ কথার দলিল যে, খেলাফত কায়েম করাও উম্মতের কাঁধে অর্পিত এক স্বতন্ত্র ফরজ দায়িত্ব।

সেই পুরোনো কথা

যদি আরোপিত আপত্তির উপর চিন্তা-ফিকির করা হয়, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা মূলত ঐ আপত্তি যার ভিত্তিতে খারেজিদের কিছু ফেরকা অনেক আগেই ইজমায়ে উম্মতের বিরোধীতা করে খলিফা নিযুক্ত করার ফরজ দায়িত্বকে অস্বীকার করেছিলো। খাওয়ারিজদের উক্ত দলীল আর সমকালীনদের দাবী মাঝে যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে সেটা হলো, খারেজিদের সেই পুরোনো দলীল, এই নতুন আপত্তি ও দলীলের তুলনায় অধিক সূক্ষ ও আমানতদারিতার উপর ভিত্তিশীল। কেননা সেই পুরোনো দলীলে কেবল হুদুদ-কিসাস ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের উপরই কেবল দৃষ্টি আরোপ করা হয়নি যেগুলো খেলাফত প্রতিষ্ঠার পরে আরোপিত হয়, বরং সাথে সাথে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাকেও একটা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু এ সবগুলোকে জরুরি মনে করা সত্ত্বেও এগুলোর জন্য আবশ্যক খেলাফত প্রতিষ্ঠাকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করেছে।

ইবনে খালদুন রহিমাহুল্লাহ এসব খারেজিদের বক্তব্য নকল করে বলেন,

وقد شذّ بعض النّاس فقال بعدم وجوب هذا النّصب رأسا لا بالعقل ولا بالشّرع منهم الأصمّ من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم، والواجب عند هؤلاء إنّما هو إمضاء الحكم الشّرع فإذا تواطأت الأمّة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام

ولا يجب نصبه (تاريخ ابن خلدون ٢٤٠/١، (المقدمة) الباب الثالث، الفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه.)

কতক লোক বিচ্ছিন মত গ্রহণ করেছেন যে, খলিফা নিয়োগ দেওয়া উম্মতের উপর আবশ্যক নয়, শরয়ী দলিলের আলোকেও নয়, আকলি দলিলের মাধ্যমেও নয়। এদের মধ্যে একজন হলো মুতাজিলি মতাদর্শের আসম আর কতক খারেজি ফিরকার মতও এমনই। তাদের বক্তব্য হলো, মানুষের উপর শুধু শরয়ী বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। উম্মত যখন ন্যায়পরায়নতা ও আল্লাহর বিধানের বিষয় একমত হবে তখন আর একজন ইমাম নির্ধারন করা আবশ্যক হবে না।[14]

উভয় দলের এই মিলকে "অনাকাঙ্খিতভাবে মিলে যাওয়া" বলা হোক অথবা "পুরাতন কৌশলীদের নতুন জাল" হিসেবে ব্যক্ত করা হোক, অভিজ্ঞতা হলো, মুসলমানদের মাঝে ঐক্যমতপূর্ণ মাসআলাসমূহে কাটছাট করে যে দলিল-প্রমাণ ও আপত্তির স্তুপ জমা করা হয়, সাধারণভাবে সেগুলো কোনো না কোনো পূর্ববর্তি কোনো বাতিল ফিরকার আলোচনায় ও উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়, যেগুলোকে আমাদের সালাফরা তাদের কিতাবসমূহে সেসকল বাতিল ফিরকার দিকে সম্পৃক্ত করে সংরক্ষণ করেছেন। এবং সেগুলোর শক্তি খণ্ডন করেছেন। সে সকল ভ্রান্ত দলিল-প্রমানের কারণে এই একবার বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার স্বাধ আস্বাধন করেছে। এবং বর্তমানে—যেভাবেই বিষয়টিকে বক্ত করা হোক—সেসব দলিলগুলোর মাঝে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে আরেকবার বেচারা অসহায় উম্মতকে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার আযাবে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

[14] তারিখে ইবনে খালদুন ১/২৪০

আল্লাহ তায়ালা এই নির্যাতিত-নিপিরীত উম্মতে মুসলিমাকে খেলাফত ও নেতৃত্বের সম্মান-মর্যাদা দ্বারা সৌভাগ্যবান করুন। আমিন।

সমাপ্ত[15]

[15] মূল প্রবন্ধটি ১৪৪১ হি. (২০২০ খ্রি.) সনে পাকিস্তানের বিখ্যাত সাময়িকি "মাজাল্লায়ে সফদার"-এর রমাদান ও শাওয়াল (মে-জুন) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।